



মোবাইল: নং -০১৭১৩৭৪১৬৮৬

ই-মেইল -debesh00007@gmail.com

এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার বীরত্ব গাঁথা

-দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

উনিশ শ' একাত্তর সাল ১২৫ মার্চ '৭১ রাত সাড়ে এগারটার পর পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁনের অনুমোদন ক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক বাহিনী প্রধান লে. জে. টিক্কা খাঁনের নেতৃত্বে “অপারেশন সার্চলাইট” শুরু হলো। বাঙালিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল। পাকিস্তানি হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণের কারণে বাঙালি সৈনিক, ই.পি.আর, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্যরা যার যার অবস্থান থেকে শুরু করলো সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ২৬ মার্চ '৭১ থেকে শুরু হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ। ২৫ মার্চ '৭১ কাল রাত থেকে শুরু হলো পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা। ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর চালানো বিনা বিচারে জ্বালাও, পোড়াও, নির্যাতন, হত্যা ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজ। ২৫ মার্চ '৭১ এর পর আস্তে আস্তে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা সারা দেশের অধিকাংশ জায়গায় ক্যাম্প করলো। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে হেরে যাওয়া জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা কর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষ নিল। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের সহযোগিতার জন্য পীচ কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তুললো। পাকিস্তানি সৈন্যরা সারা দেশে ধর পাকড় করতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় সারা দেশ ব্যাপী জ্বালাও, পোড়াও, হত্যা, গণ হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোর করে ধর্মান্তর করণ ও চাঁদা বাজি সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ করতে থাকলো। ৭ মার্চ '৭১ এর পর থেকে পাকিস্তানি বিহারী সৈন্যরা তাদের সাথে চাকরি করা বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে থাকলো। কিছু বাঙালি সৈন্য অস্ত্র নিয়ে অথবা খালি হাতে পালিয়ে এলেন। হানাদারেরা তাদেরই সাথে কিছু বাঙালি সৈনিক কে হত্যা করে ছিল। পীচ কমিটির লোক, রাজাকারেরা ও স্বাধীনতা বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুদের বাড়িঘর চিনিয়ে দিত। রাজাকারেরা পাকিস্তানি সৈন্যদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে গ্রামে যেতো। তারা চিনিয়ে দিত কোন বাড়ির লোক মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তারা পাকি হানাদারদের তথ্যদিত, বাড়িঘর লুটতরাজ, আগুন দিত ও চাঁদা বাজি করতো। তাদের এই নির্ধূরতা দেখে জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। ২৫ এপ্রিল '৭১ পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের জেলার উল্লাপাড়া থানার চড়িয়া নামক গ্রামে গণ হত্যা করলো। এই গণ হত্যার শিকার হিন্দু, মুসলিম নারী পুরুষের ১২৯ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। ০৮ মে সাঁথিয়া থানার করঞ্জা ও ১৪ মে ফরিদপুর থানার ডেমড়া ও সাঁথিয়া থানার রূপসী, বাউসগাড়ী গণ হত্যা হলো। করঞ্জায় স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সৈন্যরা মেগা ঠাকুর পরিবারের ৩ জন সহ ৮ জনকে নৃশংস ভাবে হত্যা করলো। ডেমড়া, রূপসী ও বাউসগাড়ী গণহত্যায় আমাদের দাদু প্রবোধ কুমার মজুমদার (মোনা মজুমদার) ও লালু চক্রবর্তী সহ চার শতাধিক হিন্দু মুসলমান নর-নারীকে হত্যা করলো। উল্লাপাড়া থানার কান সোনা ঘোষ পাড়া গণ হত্যা হলো। দেশের ভয়াবহ অবস্থা। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক এক রাতে এক এক গ্রাম ঘিরে রেখে ভোর থেকে গণ হত্যা চালায়। এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী সহযোগীদের দিয়ে লুটতরাজ চালায়। বাড়িঘর ও দোকানে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কাল রাতের অপারেশন সার্চলাইট এর পর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুরা অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ '৭১ কাল রাতে নৃশংস আক্রমণ চালালে বাঙালি সৈন্য, ই.পি.আর পুলিশ, আনসার ও অন্যান্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায়। বাঙালি সৈনিক, ই.পি.আর, আনসার ও অন্যান্য প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এদেশের অধিকাংশ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য নারী-পুরুষ। ২৬ মার্চ '৭১ শুরু হয়

স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধ। পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙালিদের কুলিয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য বাঙালি সৈন্য ও অন্যান্যরা ভারতে আশ্রয় নেয়। আমাদের গ্রামের একজন মানুষও পীচ কমিটির সদস্য, রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী হয় নাই। সব মুসলমানেরা হিন্দুদের বিভিন্ন নিরাপত্তা দিয়ে ছিলেন। আদি কাল থেকে হিন্দু- মুসলমানেরা এ গ্রামে মিলে মিশে বসবাস করে থাকেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা উপস্থিত হলে মুসলমান গন হিন্দুদের বিভিন্ন ভাবে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। আমাদের গ্রাম টি বিশ্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অনন্য গ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে গ্রামের অধিকাংশ হিন্দুরা পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়ে তাঁদের স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়িতে রেখে এসে ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর'৭১ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের পর প্রতিবেশী মুসলমানেরা তাঁদের কাছে জিন্মা রাখা সকল স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী অক্ষত অবস্থায় বুঝে দিয়ে ছিলেন। ডেমড়া গণহত্যার পর থেকে আমরা দিন রাত গ্রাম পাহাড়া শুরু করলাম। প্রতিবেশী মুসলমান যুবকেরা আমাদের সহযোগিতার জন্য সাথে থাকলেন। আমাদের পরিবার কয়েক দিন রাতে প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ঘুমাতে। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা এত ভালো যে, তাঁরা আমাদের জন্য ঘর ও বিছানা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বারান্দায় ঘুমাতে। আমরা কয়েক দিন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আমাদের গ্রাম অপেক্ষা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বাচড়া গ্রামের আমাদের পিতৃদেবের শিষ্য মাখনলাল সিংহের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকলাম। একাকী মনে মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষের বাড়িতে আর কত দিন থাকা যায়। কিছু দিন পর আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলাম। ৬ শ্রাবণ ১৩৭৮ মাসে। দিনটি ছিল ২৩ জুলাই'৭১ শুক্রবার। বর্ষাকাল রাত ৮ টার দিকে দেখি আমাদের বাড়ির অদূরে পালেদের বিলে একটি ছই ওয়ালা নৌকায়। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব মো: আব্দুর রহমাপনের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর জন্য ভারত নিয়ে যাচ্ছেন। নৌকা দেখে আমার পড়ার খাতার একটি পৃষ্ঠা ছিড়ে মাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিরকুট লিখলাম। চিরকুট টি ছিল—“মা, প্রণাম নিও, বাবাকে আমার প্রণাম দিও। বড় দাদা, মেজদাদা ও বৌদিকে প্রণাম দিও। ছোট ভাই বোনকে স্নেহাশিষ্য দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না জন্য না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেন বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি। ইতি- তোমার ছেলে দেবেশ।” আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। একটি বি.এস.এফ ক্যাম্পে ঢুকলাম। শৌচকর্মাদি করে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। বি.এস.এফ ক্যাম্পেএম.পি.এ স্যার ও আমাদের গাইডার কে চেয়ারে বসতে দিলেন। আমাদের সবাই কে এক লাইনে দাড় করালেন। আমাদের গণনা করা হলো। আমরা হলাম ২২ জন। এম.পি.এ স্যার যোগাযোগ করে আমাদের কে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। এম.পি.এ স্যার আমাদের সাথে মালদহ পর্যন্ত গেলেন। মালদহ বাজার থেকে মুড়ি ও কাঠাল কিনে আমাদের খাওয়ালেন। তারপর আমাদের কে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে কোলকাতা চলে গেলেন। আমরা রাত ৯ টার দিকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁরা আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পর দিন সকালে আমাদের সবাইকে ফলোইং করালেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ফলোইং করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো, পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, রতন কুমার দাস ও মো: নজরুল ইসলাম কে ট্রান্সফার করলো মালধ ও কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্পে, মালধ ও কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে আমাদের কে আনা হলো পতিরাম প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে। পতিরাম প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এক যোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে ২০/২২ জন কে নিয়ে আসা হলো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে। ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার সিট করে দিল। আমাদের প্রত্যেক কে একটা মগ, একটা প্লেট, দুই টা প্যান্ট, ২টা গেঞ্জি, একটি মশারি, ও বিছানা পত্র দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। প্রশিক্ষণ শুরুর দিনে প্রশিক্ষণ কো-

অর্ডিনেটর প্রথমে ফলইন করিয়ে প্রশিক্ষনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও অন্যান্য বিষয়ে বললেন। তারপর তিনি বললেন দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ক্যাপটেন ডি এস ভিলন স্যার আসবেন। ঠিক দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান শিখ সেনা ক্যাপটেন ডি এস ভিলন স্যার এলেন। তিনি আমাদের সকল কে উদ্দেশ্য করে হিন্দিতে যা বললেন তার অর্থ হলো-“...আপনাদের কে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশ মাতাকে হানাদার মুক্ত করতে জীবন পন যুদ্ধ করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিব। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্য দাতা পিতা মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য তাঁদের সন্তানদের কে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...”। পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প টি ৭ নং সেক্টরাধীন একটি হায়ার ট্রেনিং ক্যাম্প। পানিঘাটা স্থান টি ছিল চারি দিকে পাহাড়ের মধ্যে একটি বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলে বনমানুষ, নকশাল ও অন্যান্য খারাপ মানুষের বসবাস ছিল। স্থানটি ছিল কার্শিয়ান পাহাড় হইতে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বের বনাঞ্চল। আমাদের ট্রেনিং স্থানটি ছিল পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্ব অবস্থিত। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। আমার জীবনে এই প্রথম পাহাড় থেকে ঝর্ণার জল আসা দেখলাম। ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বের পাড় ঘেঁষে মর্টার ট্রেনিং হতো। আমাদের ২১ দিনের ট্রেনিং হলো। আমাদের কে থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এল, এম,জি,এস,এল,আর, স্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাষ্ট এইড সহ অন্যান্য ট্রেনিং দিলেন। যুদ্ধে সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহীদ হলে করণীয় সম্পর্কে এবং ফাষ্ট এইড সম্পর্কে ধারণা দিলেন। ভারতীয় কয়েক জন হিন্দু বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষণ দিলেন আমাদের কোম্পানীর। আমাদের কোম্পানীর নাম ছিল ডেল্টা কোম্পানী। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ক্যাপটেন ডি.এস. ভিলন। বিদায়ের সময়ে জানতে পারলাম আমার এফ.এফ নং-৪৭৪২। আমি ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিলাম। আমাকে ও অন্যদের ৭ নম্বর সেক্টরের সেক্টরের ভারতের কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর হেড কোয়ার্টারের আনা হলো। আমাকে একটি গেরিলা গ্রুপের সদস্য হিসেবে অস্ত্র ও গোলা বারুদ দেওয়া হলো। আমরা গেরিলা গ্রুপ নিয়ে বাংলাদেশে অভ্যন্তরে এসেছিলাম। আমার গ্রুপ কমান্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব এম. এ মান্নান। আমি কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারের অধীনে ৪টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। কমান্ডারের অধীনে ১) বেলকুচি থানা অপারেশন, ২) জামতৈল ও কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে এ্যাসুস ও ৩) বেলকুচি থানার কল্যানপুর যুদ্ধ। ডেপুটি কমান্ডারের অধীনে শাহজাদপুর উপজেলার সোনাতনী ইউনিয়নের ধীতপুর নামক গ্রামের মাঝ দিয়ে যাওয়া ওয়াপদা বাঁধে। আমাদের গ্রুপের গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধগুলোর বিবরণ হলোঃ-

১. বেলকুচি থানা অপারেশন :

বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। এই থানা অপারেশনে নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার। ২৪ অক্টোবর ৭১ কমান্ডার স্যারের ও আরো ৩ জনের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও মুসলিমলীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমণ করে ছিলাম। সন্ধ্যায় বানিয়া গাতি শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করে ছিলেন। কমান্ডার স্যার আমাদের গ্রুপ কে দুই গ্রুপে ভাগ করে দিয়ে ছিলেন। সিদ্ধান্ত ছিল কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় গ্রুপটি থানা আক্রমণ করবে। অন্য গ্রুপটি রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের গ্রুপে থেকে থানা আক্রমণ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলাম। রাত ৯ টায় বানিয়া গাতি শেল্টার থেকে যাত্রা করে ছিলাম। থানার কাছে গিয়ে দু গ্রুপ টার্গেটের উদ্দেশ্যে ভাগ হয়ে ছিলাম। রাত ১২টায় একযোগে আক্রমণের সিদ্ধান্ত। পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের গ্রুপ থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে স্ট্রোলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্দ্রি দেখে ফেলে ছিল। হুইসেল বাঁজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদের কে লক্ষ্য করে সেন্দ্রি গুলি করা শুরু করে ছিল। তাঁরপর আমাদের গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করে ছিলেন। তারপর সবাই একযোগে গুলি শুরু করে ছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ হয়ে ছিল। যুদ্ধটি ছিল ভয়াবহ যুদ্ধ। আমার মাথায়

হেলমেট ছিল। দুইটি গুলি এসে আমার হেলমেটে লেগে ছিল। আমার ডান পাশে অবস্থান নিয়ে ছিলেন যুদ্ধের কমান্ডার। বিজয় আর না হয় মৃত্যু ছাড়া কোন পথ ছিল না। আমরা সবাই বৃষ্টির মত গুলি চালাচ্ছিলাম। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কমান্ডার স্যার আমাদের লক্ষ্য করে বললেন-“দেবেশ মাথা তুলো না, গুলি চালিয়ে যাও”। আমাদের গুলির কাছে হেরে গিয়ে থানার পুলিশ ও রাজাকারেরা থানার পিছনদিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর যমুনা নদীতে থাকা একটি লঞ্চে আমাদের রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গিয়ে ছিল। থানার সেন্ত্রি গুলি করা বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করলো। তারপর আমরা সবাই থানার ভিতরে ঢুকে পড়ে ছিলাম। থানার মাল খানা থেকে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে ছিলাম। এই যুদ্ধে দু’জন রাজাকারকে জ্যাস্ত ধরে নিয়ে এসে ছিলাম। ভোর হয়ে গিয়েছিল। মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করা দলটিও এলো। মতিন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে অধিকাংশ বাড়ি ও দোকানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি করে রেখে ছিল। থানার আশেপাশের লোকজন দোকান ও বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। বিজয়ী হয়ে আমরা ভোরের দিকে কিছু সময় বিজয় উল্লাস করলাম। তারপর ধরে আনা রাজাকার দুই জন সহ আমরা বেলকুচি থানার একটি নিভৃত গ্রামে শেল্টার নিলাম। ঐ দিন বেলা ১১.০০ টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর থেকে বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা বেলকুচি থানায় এলো। তারা বেলকুচি থানার আশে পাশের কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে কয়েক জন যুবক কে ধরে এনে অত্যাচার করেছিল। বেল কুচি থানা অপারেশনের সময়ে আমরা ২ জন রাজাকার কে ধরে এনে ছিলাম। প্রথমত রাজাকার দুইজন কে আমাদের শেল্টারের একটি রুমে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার স্যারের অনুমতি নিয়ে তাদের রুমে গেলাম। আমি রুমে ঢুকে তাঁদের নাম ও ঠিকানা জানলাম। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দিন। আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি রাজাকার ২ জনের চোখের বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর তাদের রাজাকার হওয়ার প্রেক্ষাপট জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা যা বললেন- তার মোটা মাটি অর্থ হলো- আমরা রাজাকার সম্পর্কে কিছু বুঝিনা। আমরা গরীব মানুষ। আমরা বিবাহিত। আমাদের পরিবারে বাবা, মা স্ত্রীও ছেলে মেয়ে আছে। আমরা রাজাকার হওয়াটা একটি চাকরি মনে করে রাজাকারে ভর্তি হয়েছি। আমরা কাউকে কোন প্রকার অত্যাচার করি নাই। আমরা কখনো পাকিস্তানি সৈন্যদের কে সাথে নিয়ে গিয়ে কোন বাড়ি লুটতরাজ করি নাই। কোন বাড়িতে আগুন দেই নাই। কোন মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি- চিনিয়ে দেই নাই। আমরা চাকরি করি, বেতন পাই। সেই টাকা দিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ করি। আপনি দয়া করে সবাই কে বলে আমাদের কে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা আর রাজাকারে ফিরে যাবো না”। তাদের দেখে ও তাঁদের কথা শুনে মায়া হলো। দুপুরে রাজাকার দুই জনকে সাথে নিয়ে সবাই এক সাথে বসে খেলাম। বিকালে কমান্ডার স্যার কে তাঁদের সাথে আলাপ চারিতার কথা বললাম। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। রাত ৯.০০ টার দিকে আবার রাজাকার দুই জন কে সাথে নিয়ে শেল্টারে বসে এক সাথে খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর শেল্টার পরিবর্তনের জন্য যাত্রা করলাম। চলার পথে কমান্ডার স্যার কে রাজাকার দুইজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানালাম। কমান্ডার জনাব এম, এ মান্নান স্যার ছিলেন শিক্ষিত ও ভালো মানুষ। তিনি আমার অনুরোধে রাজাকার দুই জনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। স্যারের অনুমতি পেয়ে আমাদের গ্রুপের সবাইকে রাস্তায় দাড় করিয়ে রেখে আমি আর-আমাদের গ্রুপের সহযোদ্ধা দৌলতপুর গ্রামের মোঃ শামসুল হক রাজাকার দুই জন কে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলাম। সর্বশেষ বলে এলাম আপনারা সরাসরি বাড়িতে চলে যাবেন। আর থানায় ফিরে যাবেন না। আর রাজাকারে যাবেন না। দেশ অল্প দিনের মধ্যেই স্বাধীন হবে। বেলকুচি থানা অপারেশন যুদ্ধে আমাদের গ্রুপের সাথে ছিলেন কাজিপুরের জনাব মোঃ আমির হোসেন ভুলু এর দল সহ আরো বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল।

২. কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন সন্নিহিত এ্যাম্বুস :

কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন ও জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে আমরা এ্যাম্বুস করেছিলাম। কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এই এ্যাম্বুসের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান। ৪ নভেম্বর’৭১ গ্রুপের বাব্রুল গ্রামের সিরাজগঞ্জের এম,এন, এ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভায়রা আওয়ামীলীগ নেতা জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন ও জামতৈল স্টেশনের মাঝে পথে আমরা এ্যাম্বুস করেছিলাম। এই রাতের পাশওয়ার্ড ছিল ১. জবা ও ২. পলাশ। কমান্ডার স্যার-নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে

গিয়ে কারণ বশত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে সবাই একত্রিত হবো। আমার তামাই গ্রামের বাড়িতে। কমান্ডার স্যার ক্রোলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসে ছিলেন। গ্রুপ কমান্ডার স্যার ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ছিলেন। আমরা সবাই ধানক্ষেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। কমান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারী। টর্চ লাইট ও হ্যারিকেন হাতে রেল লাইনে পাকি মিলি শিয়া ও রাজাকারেরা টহল দিচ্ছিল। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছিল। মাইনটি পাকি হানাদারদের নজরে পড়ে ছিল। পাকি হানাদাররা হুইসেল দিয়ে রাজাকারদের লাইং পজিশনে রেডি থাকতে কমান্ড করলো। আমাদের দিকে টর্চ লাইট মেরে মেরে উর্দুতে বকাবকি করতে থাকলো। ইতিমধ্যে ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ গামী পাকি হানাদার বাহী একটি ট্রেন এলো। পাকি হানাদারেরা সিগন্যাল দিয়ে স্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিল। ট্রেনের পাকি হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমাদের কে খুঁজতে থাকলো। আমাদের মাইনটি ব্রাষ্ট করা সম্ভব হলো না। পাকি হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন। আমরা ক্রোলিং করে কিছু দূর পিছিয়ে এসে তামাই গ্রামে চলে এসে ছিলাম। পরের দিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুরের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামের অনেক বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং গ্রামের অনেককে ধরে নির্যাতন করেছিল। আমরা এ্যাম্বুস থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয় ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশ কিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছিল। এত বড় প্লাটুন এক শেল্টারে শেল্টার নেওয়া সমস্যা। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী কে কমান্ডার করে আমাদের কয়েক জনের আর একটি গ্রুপ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কমান্ডার স্যার নির্দেশ দিয়ে বললেন- আজ থেকে আমাদের গ্রুপের ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চী কে আমার দ্বিতীয় গ্রুপের গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মনোনীত করা হলো। দ্বিতীয় গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা গণ আমার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর কমান্ডানাধীন হয়ে কাজ করবেন। রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌চীর গ্রুপের সদস্যরা হলেন শাহজাদপুর থানার অধিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ১. মো: বজলুল করিম দুলাল। ২. নজরুল ইসলাম ৩. রতন কুমার দাস ৪. দেবেশ চন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্যরা এবং চৌহালী থানার মো: নজরুল ইসলাম। আপনারা আমাদের মূল গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করে অবস্থান নিয়ে নিয়ে আমাদের মূল গ্রুপের কাছাকাছি থাকবেন। প্রয়োজনের সময়ে আমরা দুই গ্রুপ একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্য ক্যাম্প, রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ও থানা অপারেশন করবো। সিদ্ধান্ত নিয়ে এক যোগে হেঁটে হেঁটে আমরা এলাম কল্যানপুর নামক গ্রামে।

৩. কল্যাণপুর যুদ্ধ:

কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান। বেলকুচি থানার কল্যাণপুর নামক গ্রামে একটি স্কুলে আশ্রয় নিলাম। ৫ নভেম্বর ৭১ গ্রামের কয়েক জন নেতৃ স্থানীয় মানুষ আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত নিদ্রাহীন থেকে ও হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার খেয়ে কমান্ডার স্যারের কমান্ডে আমরা প্রকাশ্যে পিটি, প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরিক্ষার করলাম। অস্ত্রে ফুলথ্রু মারলাম। কমান্ডার স্যারের কমান্ডে আমরা দুইজন করে করে ডিউটি করতে থাকলাম। অন্যান্যরা ঘুম বা বিশ্রামে থাকলাম। কল্যানপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারণা ছিল এই গ্রামে পাকি হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেক্টরিত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমাদের কে ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাকি হানাদার মিলে শিয়া ও রাজাকার আসছে। বগড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যানপুরের দিকে আসতে ছিল। দুইজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আস ছিল। দূর থেকে অনুমান হলো এই দলে ৫ জন পাকিস্তানি মিলেশিয়া ও ৮ জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার স্যার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যারের নির্দেশ মত। কল্যানপুর রাস্তার ধারে বাংকারের মত বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশ ঝাড়ের সামনে দিয়ে চলা রাস্তা ধরে পাকিস্তানি মিলেশিয়া, রাজাকারেরা এবং পথ চিনানো লোক দুইজন আসছিল। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে কমান্ডার স্যার কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পজিশন নিল। ওরাও আমাদের কে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ছিল। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকলাম। জীবন মরণ ভয়াবহ যুদ্ধ। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশে পাশের গ্রাম সমূহে

অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এসে ছিলেন। এক ঘণ্টার অধিক সময় ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ চলছিল। তারপর পাকি হানাদারেরা পিছিয়ে গিয়ে ছিল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করে ছিলাম। সাহায্যকারী বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে পরিচয় হলো। দেখা গেল জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ বাবর আলীর মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ সহ কয়েকটি গ্রুপ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এসেছে। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। বিকাল ৩.০০ টার দিকে এক ব্যক্তি দৌড়ে হাপাতে হাপাতে আমাদের কমান্ডার স্যারের কাছে এসে বললেন-“বেলকুচি থানা ও অন্যান্য যায়গা থেকে বেশ কিছু হানাদার সৈন্য ও রাজাকারেরা ভারী অস্ত্র নিয়ে আপনাদের কে আক্রমণ করার জন্য আসছে। সংবাদটি পেয়ে কমান্ডার স্যার সবাই কে নিরাপদ স্থানে সড়ে পরার নির্দেশ দিলেন। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন হয়ে আমরা কয়েক জন হেঁটে পিড়ার চর, খাসিয়ার চর, ও অন্যান্য গ্রাম ঘুরে দৌলতপুর গ্রামের সহযোগী মোঃ শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিয়ে ছিলাম। পর দিন বেতকান্দি মিস্ত্রীবাড়ির ফাঁকা ভিটায় এসে কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম। মোঃ কোরপ আলী মোল্লা নামক এক জন নেতৃত্বান্বীত ব্যক্তি আমাদের সকালের খাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি তার বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমাদের কমান্ডার রাজি হলেন না। আমরা ফরিদ পাঙ্গাসী গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আলহাজ্ব মোঃ আবু তালেব মাষ্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। কয়েক দিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে শেল্টার নিয়ে থাকলাম। প্রতিদিন রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাসওয়ার্ড দিতেন। প্রতিদিন সকালে অস্ত্রে ফুল থু মারা হতো ও তেল দেওয়া হতো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্য ক্যাম্প ও রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য গ্রুপ করে রেকি করতাম।

৪. ধীতপুর যুদ্ধ:

ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চী। ১২ ডিসেম্বর ৭১ রাতে আমাদের শেল্টার ছিল সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্তী, আখর হাজী ও অন্যান্যের বাড়িতে। ১৩ ডিসেম্বর ৭১ বেলা ১২.০০ টার দিকে সংবাদ পেলাম পাকি হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাকি হানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পাড় হয়ে মালিপাড়া রাজাকার ক্যাম্প এসে ছিল। মালিপাড়া ক্যাম্প থেকে রাস্তা চিনানোর জন্য দুই জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াপদা বাঁধ ধরে বেড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কৈজুরী থেকে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পিছু নিলাম। আমরা পাকি হানাদারদের অনুসরণ করছিলাম। আমাদের কমান্ডারের নির্দেশ ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের লোকজনদের আর ক্ষতি না করলে আমরা ওদেরকে কিছু বলব না। ওরা ক্ষুধার্ত। কৈজুরী গ্রামের একজনের মুলা ক্ষেত থেকে মুলা খাওয়ার চেষ্টা করলো। ওরা হয়তো জানতো না কাঁচা মুলা খাওয়া যায় না। ওয়াপদা বাঁধ ধরে ওরা অগ্রসর হতে লাগলো। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধী। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে ছিল। আমরা জাম্প করে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে পজিশন নিয়ে ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারেরা ওয়াপদা বাঁধের পূর্ব পার্শ্বে পজিশন নিয়ে ছিল। এক ঘণ্টার অধিক সময় ব্যাপি গুলি পাল্টা গুলি চলতে থাকলো। গুলির শব্দে শাহজাদপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও বেড়া থানার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করলো। আমরাও অন্ধকারে গুলি করা বন্ধ করে দিয়ে ছিলাম। সারারাত আমরা না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিল বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন। এই যুদ্ধে আমি থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালিয়েছি। আমার বাম পার্শ্বে অবস্থান ছিল আমার কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচীর। তিনি এলএমজি চালাচ্ছিলেন। আমার ডান পার্শ্বে অবস্থান পজিশন নিয়ে অস্ত্র চালাচ্ছিলেন কাদাই বাদলা গ্রামের মোঃ নজরুল ইসলাম, পুকুর পার গ্রামের রতন কুমার দাস ও অন্যান্যরা। আমাদের গ্রুপের ডান পার্শ্বে অবস্থান ছিল বেড়া থানার এস এম আমির হোসেন এর গ্রুপ ও অন্যান্য গ্রুপ। সারা রাত দুই জন রাজাকার মাঝে মধ্যে কাভারিং ফায়ার করছিল। আমরাও ওদের ফায়ারের জবাবে দুই একটি করে ফায়ার করছিলাম। ভোরের দিকে আমাদের কমান্ডার ও

অন্যান্যরা রাজাকার দুই জন কে ঘিরে ধরে আত্মসমর্পন করিয়ে ছিল। রাজাকার দুই জন কে আত্মসমর্পন করানোর পর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল রাত ১২.০০ টার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদেরকে কভারিং ফায়ার চালানোর নির্দেশ দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেড়ার দিকে পালিয়ে গেছে। পরে জানা গেল। ঐ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেড়া নদীতে থাকা ভেড়া কোলা গ্রামের হলদারদের নৌকায় বেড়া নদী পাড় হয়ে নগর বাড়ি হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের দুই জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। ঐ দিন স্থানীয় দুজন পথচারী গোলাগুলির সময়ে গুলি লেগে মারা গিয়ে ওয়াপদা বাঁধের উপর পরে ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও রাজাকাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধের রণাঙ্গনে বেড়া থানার এস.এম.আমি হোসেন গ্রুপের সাথে ১. মো: আব্দুল খালেক ও ২. মো: আমজাদ হোসেন শহিদ হয়েছেন। দুই জন সাধারণ মানুষ যুদ্ধের সময়ে গুলি লেগে ওয়াপদা বাঁধের উপরে মারা গিয়ে ছিলেন। এই যুদ্ধে আমাদের গ্রুপসহ আমাদের সহযোগী অন্যান্য গ্রুপের ১৪/১৫ জন আহত হয়েছিলেন। আমাদের গ্রুপের শেষ যুদ্ধ ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমাদের গ্রুপ এসে ক্যাম্প করে জামিরতা হাই স্কুলে। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ শাহজাদপুর থানাস্থিত অন্যান্য এলাকাও পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য মুক্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বর'৭১ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৯১,৬৩৪ জন পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) আত্মসমর্পন করেন সরকারের নির্দেশে ২৪ জানুয়ারী'৭২ সিরাজগঞ্জ শহরস্থ ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় স্থাপিত অস্থায়ী অস্ত্র জমা নেওয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। মুক্তিবাহিনীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে ঘোষণা দিয়ে সরকারের উদ্যোগে ন্যাশনাল মিলে শিয়া ক্যাম্প তৈরী করা হলো। আমাকে মহকুমা প্রশাসকের অফিস থেকে ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি হওয়ার কথা বললেন। আমি ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি হলাম না। বাড়িতে এসে আমাদের রতন কান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল এম.কম.এম.এড এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণির অটো পাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। শুরু হলো লেখা-পড়া ও অন্যান্য জীবন।

মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি: দেবেশ চন্দ্র সান্যাল, পিতা: দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল, মাতা: নিলীমা রানী সান্যাল, গ্রাম ও ডাকঘর: রতন কান্দি, ইউনিয়ন: হাবিবুল্লাহ নগর, উপজেলা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ। গেজেট নং- বে-সামরিক সিরাজগঞ্জ-১৬৭৯। ভারতীয় প্রশিক্ষণ - এফ.এফ. নং-৪৭৪২। সমন্বিত তালিকা জেলা ভিত্তিক - ১৪১১, উপজেলাভিত্তিক-১৫৮ মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি - ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, ডিজিটাল সনদ ও পরিচয় পত্র নং- ০১৮৮০০০১৪১১।